পঞ্চম অধ্যায়

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাস

পঞ্চম অধ্যায়

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাস

কন্দলী মাধব ও পন্ডিত কৃত্তিবাস – এই দুই কবির উদ্ভবের মধ্যে অব্দগত বিচারে অবশ্যই ব্যবধান আছে কিন্তু রামভক্তি প্রবন উচ্ছ্বাসের মধ্যে– মধ্যযুগীয় ভাব আন্দোলনের অভিঘাতে উভয়ের অন্তর একই তরঙ্গে উদ্বেলিত, একই সুরে ধ্বনিত, একই বিশ্বাসে সুস্থিত। এইদিক থেকে তাঁরা একাত্মক।

কন্দলী শব্দের মধ্যে যে তর্ক যুক্তি বিচারের ব্যঞ্জনা আছে, পন্ডিত কথার মধ্যেও তারই আভাস। কৃত্তিবাসের ভনিতায় মুখ্য বিশেষণ দুইটি পন্ডিত ও বিচক্ষণ।

কৃত্তিবাস পন্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী ॥

অথবা বাল্মীকি বন্দিনা কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিলা ভাষা রামায়ণ ॥

মাধব ও কৃত্তিবাস দুই জনেই রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভে রামায়ণ রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। মাধবের উক্তি –

মহাঋষি বাল্মীকিয়ে রামায়ণ করিলন্ত
সাক্ষাতে জানিবা যেন বেদ।
শ্রবণে অমৃতময় সকল পাপর ক্ষয়
সংসারের বন্ধ হব ছেদ ॥
*** *** *** ***
কবিরাজ কন্দলি যে আমাকে সে বুলিবয়
করিনোহো সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিকে যে
বরাহ রাজার অনুরোধে ॥

কৃত্তিবাসের উক্তি —

বাপমায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান ।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকান্ড গান ॥
সাতকান্ড কথা হয় দেবের সুজিত ।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পন্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে ।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে ॥

কান্ডে কান্ডে বিস্তৃত মূল বিষয়বস্তু এক হলেও রামকথার বিন্যাসে কোথাও নাঘব খানিকটা অমিল আছে দুই কবির রচনায় । অযোধ্যাকান্ড কন্দলী শেষ করেছেন রামচন্দ্রের অত্রি আশ্রম ও বনান্তর ভ্রমণের কথায় । কৃত্তিবাস বৎসরান্তে গয়াতে রামের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনায় । অরণ্য কান্ডের মুখ্য বিষয় সীতা-হরণ ও সীতা অন্বেষণ । কৃত্তিবাস কবন্ধ বধ ও শবরীর উপাখ্যানেই ইতি টেনেছেন আর কন্দলী চম্পা সরোবরের বর্ণনা দিয়ে শেষ করেছেন । কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের বিষয় সুগ্রীব মিলন, বালীবধ ও সীতান্বেষণ । উভয় কবির বিন্যাস মোটামুটি এক । সুন্দরা কান্ডে একটু পার্থক্য আছে । কন্দলী রামশিবিরে বিভীষণের আগমন দিয়ে শেষ করেছেন । কৃত্তিবাস আর একটু এগিয়ে ভগ্নলোচনের বধ ও লংকাপ্রবেশ । বাল্মীকির যুদ্ধকান্ডকে উভয় কবিই লংকাকান্ড বলেছেন । মূল বিষয়গত ঐক্য থাকলেও বিবরণে বহু অনৈক্য আছে । বহু অন্যকথা যোজনা করেছেন কৃত্তিবাস — যা কন্দলী করেন নি । এই পার্থক্য বা বিভিন্নতার মূল কারণ উভয় কবির রচনাদর্শের ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্য । কন্দলী বলেছেন

সাতকান্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো
লম্ভা পরিহরি সারোদ্ধৃত ।
মহামাণিকর বোলে কাব্যরস কিছো দিল
দুগ্ধক মথিলে যে ঘৃত ॥

অর্থাৎ কন্দলী মূলতঃ বাল্মীকি রচিত কথাকেই সংক্ষেপে লম্ভা বা অসার পরিহার করেই রচনা করেছেন । কিছু কিছু কাব্যকথা আছে বটে, রাজা রস সৃষ্টির জন্য তা করতে বলেছিলেন — আর তা দুগ্ধমন্থনে ঘৃতের মতো স্বাভাবিক বর্ণনার পরিণতির সঙ্গে

সংযুক্ত । কিন্তু কৃত্তিবাসে অনাবশ্যক অর্থাৎ বাল্মীকির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে অসম্পর্কিত বহু বিষয়ে সন্নিযোজনা করেছেন । কারণ কৃত্তিবাস, কন্দলীর মতো কেবল বাল্মীকিকেই অনুসরণ করেন নি, জৈমিনি ভারত, অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, পদ্মপুরাণ – পাতাল খন্ড, প্রমুখ নানা স্থান থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন । কৃত্তিবাস নিজেও কবুল করেছেন —

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে ।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার ।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥
কৃত্তিবাস পন্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে ।
লঙ্কাকান্ড গাইলেন গীত রামায়ণে ॥

বাল্মীকির প্রতি অবিচলিত একনিষ্ঠ আনুগত্য কন্দলীর উপজীব্য – কৃত্তিবাসে তার একান্ত অভাব । এই কারণে বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের বর্ণিত তরণীসেন বধ, মহীরাবণ বধ, অকাল বোধন, রাবণের মৃত্যুবাণ প্রমুখ অনপ্রিয় বিষয়গুলি কন্দলীতে পাওয়া যায় না । ছোটখাট বিষয়ের বিন্যাসেও দুই কবির মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় অনেক ।

বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে বাল্মীকির ধারা থেকে কন্দলীও খানিকটা সরে এসেছেন, কিন্তু তা বস্তুগত ভাবে নয়, প্রয়োগ গত কৌশলের দিক থেকে । যেমন -- জয়ন্ত কাকের উপাখ্যান–হনুমানের কাছে সীতা বলেছিলেন অশোক বনে অভিজ্ঞান রূপে – তা উভয় কবিই পূর্বে বর্ণনা করেছেন । সুগ্রীব রামের কাছে বালি-বিরোধের বর্ণনা করতে গিয়ে – প্রথম তারার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা গোপন করেছিলেন । কন্দলী ও কৃত্তিবাস উভয়েই কিন্তু তা রামকে প্রথমেই বলেছিলেন । এই প্রস্তুত নিবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয় বিশ্লেষণের মধ্যে দুই কবির পার্থক্য বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে । বাহুল্যবোধে পুনরুক্তি করা থেকে বিরত থাকা উচিত ।

কন্দলী ও কৃত্তিবাস দুজন কবি-ই রামচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে কেবল বিশ্বাসী নয় – রামনাম প্রচারের ব্যাপারে সমান উৎসাহী। কিন্তু বাল্মীকির প্রতি আনুগত্য হেতু কৃত্তিবাস অপেক্ষা কন্দলী এই ক্ষেত্রেও অধিকতর সংযত। কৃত্তিবাস রাবণকেও শেষে ভক্তিরসে আপ্লুত করেছিলেন চরিত্র বিশ্লেষণের দিকে কন্দলী তা পারেন নি। রাবণ রাবণ-ই থেকে গেছেন।

রামচরিত্র বর্ণনায় তাঁর প্রেমিকরূপ – সীতা বিরহে ও বনযাত্রার প্রাক্কালে উভয় কবি-ই আলোচনা করেছেন – কিন্তু কন্দলীতে রতিভাবের প্রাধান্য আছে, কৃত্তিবাস সেখানে সাদামাটা। অঙ্গদ রায়বারে অঙ্গদের মতো কৃত্তিবাসের বহু চরিত্রে কৌতুক-রসের প্রাধান্য আছে কন্দলীতে তা অনুপস্থিত। পৌরাণিক সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে রামায়ণেও বর ও অভিশাপ এই দুইটি কাহিনীও চরিত্র নিয়ন্ত্রণের একটি মুখ্য উৎস। কারণে অকারণে দশরথ, রাম, সীতা, রাবণ প্রমুখ কেন্দ্রীয় চরিত্র ও সহায়ক বিভিন্ন চরিত্র অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন আবার হনুমান প্রমুখরা বরে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। পতির মৃত্যুতে কৃত্তিবাসের তারা ও মন্দোদরী দুজনেই সীতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কন্দলী কেবল তারার শাপের বর্ণনা করেছেন। তুলনামূলক বিচারে ভাষার তীব্রতা ও ক্রোধের প্রকাশ কন্দলীর তারার বাক্যে সমধিক প্রকাশিত কৃত্তিবাসের তারা –

সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে।।
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস।।
***　　***　　***
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে।।

কৃত্তিবাসের তারা তা কন্দলীর দুইটি পদস্তবকে আরও গাঢ় ও গভীরভাবে প্রকটিত –

বাহুর প্রতাপে তুমি সীতাকে লভিয়া।
অগণিত পরীক্ষিয়া অযোধ্যাক নিবা।।

তবু জায়া সীতাদেবী হন্ত মহাশান্তি ।
তোমাক বিছুই অন্তকালে এরিবন্তি ।।
মই যেন মরো হেয়া স্বামীর বিয়োগে ।
তোমাক বঞ্চিব সীতা দেবীর সম্ভোগে ।।
বিছোহ লগাইয়া হৃদয়ত দিয়া শাল ।
করিবা কাতর তভো যাইবন্ত পাতাল ।।

মূল রামায়ণে নিসর্গ বর্ণনার কাব্যসৌন্দর্য অনুপম । এই বিষয়ে কন্দলী মূল কবির প্রেরণায় ও আদর্শে যতটা আগ্রহী ও সার্থক কৃত্তিবাস কবি ঠিক ততখানি উদাসীন । সীতার সঙ্গে ভ্রমণকালে চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্যের শোভা এবং সীতাহারা রামের চোখে পম্পার বর্ষাশরৎ ঋতুর সৌন্দর্য দর্শনের বেদনা — একটাও কৃত্তিবাসকে আকর্ষণ করেনি ।

স্থানে স্থানে পর্ব্বতের দিব্য সরোবর ।।
নানা বিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল ।
ধবল রজনী - পূর্ণ চন্দ্র সুশীতল ।।
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ ।
সীতা বিনা সর্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত ।।
শয়ন ভোজন তার কিছু নাহি মনে ।
দিন যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে ।।

কৃত্তিবাস চিত্রকূটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে একেবারে নীরব কিন্তু কন্দলী চিত্রকূটের বর্ণনা দিয়েছেন —

জাই যূথী বকুল কন্দুলি কর্ণিকার ।
কাঞ্চন টগর কুন্দ শেফালী মান্দার ।।
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হাসি হিসি ।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশি ।। ইত্যাদি

প্রায় দশটি পদস্তবকে সুদীর্ঘ বর্ণনা । শুধু তাই নয়, শৃঙ্গার রস রসিক কন্দলী — এই স্থলেই রামের উক্তির মাধ্যমে সীতার সৌন্দর্যের কাব্যগুণসমৃদ্ধ চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন —

সীতাক সম্বুধি রামে বুলিলা বচন ।।
রাজহংস দেখা সীতা তোমার গমন ।
চক্রবাক যুগল তোমার দুই তন ।।
কলহংস যার কাঞ্চি নূপুরর নাদ ।
বদনকমল তোর দেখন্তে আহ্লাদ ।।
বদন উপরে তোর নয়ন যুগলে ।
খঞ্জন দুতয় যেন চলয়ে কমলে ।।   ইত্যাদি

শুধু নিসর্গ বর্ণনাদি ক্ষেত্রেই নয়, ক্রোধ প্রকাশ তথা আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও কন্দলীর ভাষা থেকে কৃত্তিবাসের ভাষা কোমল, খানিকটা যেন পাংশু ।– রাম বনবাসের পর ভরত অযোধ্যায় এসে সব শুনলেন । কৈকেয়ী-ই শোনালেন নিজের কৃতিত্বের কথা, কি কৌশলে রামকে বনে দিয়ে ভরতকে রাজা করেছেন । কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের ভর্ৎসনা –

নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানুষী ।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী ।।
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন ।
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন ।।
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ ।।   ইত্যাদি ।

কন্দলীর ভরতের উক্তি –

স্বামী ঘাতিনীক পৃথিবীয়ে কেনে ঘরে ।
ফাট দিয়া লুকাই খৈয়া তোক নমস্করে ।
শুষিণী নাগিনী নিকারুণী সংহারিণী ।।
নির্দরিণী রাক্ষসিনী বাঘিনী দারুণী ।
যক্ষিণী ডাহিনী তই স্বস্বামী ভক্ষিণী ।
পিশাচিনী আরো রাণ্ডী ভৈলি অলক্ষিণী ।।
সকলো লোকক শোকে মারিলি বিছুই ।
অযোধ্যা রাজ্যত তই ভৈলি সোনগুই ।।

কাহিনীর বিবরণে ও সরল ভাবে কথাবস্তুর বিস্তারে কৃত্তিবাস যতটা উৎসাহী ও পটু – নিসর্গাদি বর্ণনামূলক রচনায় বা আবেগপ্রধান সংহত সলাপের ক্ষেত্রে, কন্দলীর তুলনায় কৃত্তিবাস ততখানি নিষ্প্রভ । তবে অদ্ভুত রসের সৃষ্টিতে বা উৎকট-উদ্ভট বাগবিস্তারে কৃত্তিবাস বহুক্ষেত্রে শ্রোতৃমন্ডলী বা পাঠকবর্গের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছেন । অস্ত্রযুদ্ধ অপেক্ষা তাঁর যোদ্ধারা বাক্যযুদ্ধে বেশি পটু । যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে কল্পনার ক্ষেত্রবিস্তৃতি করাও সহজতর । অঙ্গদ বারবারের সভায় রাবণকে রামের বাণের অর্থাৎ অস্ত্রের একটা ভয়াবহ তালিকা শুনিয়েছিলেন ।

অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বাণ মহাবন ।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল ॥
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ ধরশান ।
গ্রহপতি নক্ষত্র পবন রুদ্র বাণ ॥
সূচীমুখ শিখীমুখ ঘোর দরশন ।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥

ইত্যাদি প্রায় ৬০টি এই জাতীয় অশ্রুত পূর্বনাম আছে ।

কন্দলীও যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন – নাম উল্লেখ করে বাণ নিক্ষেপ করেছেন – কিন্তু উৎকট নাম ব্যবহার করেন নি, মাত্রার মধ্যে রেখেছেন তাঁর বাক্যযুদ্ধ – কল্পনা আকাশে উধাও হয়নি ।

এই বিষয়ে আর একটি প্রশ্ন মনে আসে । প্রভূত জনপ্রিয়তার জন্য কৃত্তিবাসের পুথির বহু পাঠান্তর, সংশোধন এবং সংযোজন পরিবর্জনাদি হওয়াতে – পন্ডিত কৃত্তিবাসের মূল রচনা চিহ্নিত করা কঠিন । যেহেতু রামায়ণ তখন গান-রূপে পরিবেশিত হোতো সেক্ষেত্রে নিসর্গাদি কোন বিশেষ সৌন্দর্য বর্ণনার দ্বারা রসসৃষ্টি অপেক্ষা কাহিনীর বংকিম বিস্তারের মাধ্যমে, উদ্ভট নতুন শব্দ রচনায় অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষাদি অলংকরণের প্রয়োগে শ্রোতৃমন্ডলীর চিত্তাকর্ষণ সহজতর পন্থাটি ছিল । কন্দলীর রামায়ণে পাঠান্তরের কোন প্রমাণ নেই । কাজেই তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় রামায়ণে মূল কন্দলীতেই পাওয়া যায় । কিন্তু কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে তা আলাদা ।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাল্মীকি-কন্দলী-কৃত্তিবাসের রামায়ণের সাদৃশ্যাদি বিচারে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে — কৃত্তিবাস বহু বিষয়ের সংযোজন করেছেন এবং তিনি কেবল বাল্মীকি রচিত রামায়ণে নয়, পুরাণাদি, জৈমিনী মহাভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, লোককথা — সবকিছু থেকেই রামমহিমামূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কন্দলী বাল্মীকির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। মাধব কন্দলী রচিত আদিকান্ড ও উত্তরকান্ড পাওয়া যায় না — মাধবদেব ও শঙ্করদেব তা রচনা করে পূর্ণাঙ্গ সপ্তকান্ড রামায়ণ রচনার সহায়ক হয়েছেন। এই দুই উত্তরকান্ডের অনুবাদকের হাতেও বাল্মীকি কৃত আদি ও উত্তর রামায়ণের যথার্থ অনুবাদ। কাজেই মনে হয় রামায়ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে মাধব কন্দলী ও তাঁর উত্তরসূরিগণ শঙ্করদেব ও মাধবও রামায়ণ রচনায় বাল্মীকি ব্যতীত অন্য সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

কন্দলী যে নতুন কথা বলেন নি এমন নয়। অনেক ছোটখাট বিষয় — যেমন জয়ন্ত কাকের বৃত্তান্ত, বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত, শব্দমাদন আনবার কালে হনুমান কর্তৃক কালনেমি বধ — এসব কথা কন্দলী রামায়ণেও আছে। এইগুলি কৃত্তিবাসেও আছে। কোন সমসূত্র থেকে কি উভয় কবি এইসব বৃত্তান্ত আহরণ করেছিলেন? যদি তা না হয়, তবে একজন আর একজনের কাছে ঋণী। কাল-বিচারে মাধব কন্দলী পূর্ববর্তী কবি — কাজেই কৃত্তিবাসই হয়ত সরাসরি দেশ অসমের কাব্য থেকে এটা নিয়েছেন। কিন্তু যদি কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেহেতু নতুন — তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে পরবর্তী কোন পুথি লেখক এই চমৎকার কাহিনীগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণে সংযুক্ত করেছেন।

বস্তুতঃ বাঙ্গালী ও অসমীয়া সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার সাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই প্রবল, বর্ণমালাও প্রায় এক, ভাষাও সহোদরা কাজেই দুই কবির কাব্যের বর্ণনা, সামাজিক সংস্কারাদির সমতা স্বাভাবিকভাবেই কাব্যে প্রবেশ করেছে।

মায়ামৃগ বধ করে রাম ফিরছেন। সীতার সমুদ্বেধ চিত্ত উদবিগ্ন, দুর্নিমিত্ত দেখছেন সব।

আগে যেথে চলিলন্ত আপোনার থাব ।
পাচত শৃগালে কাটিলেক চন্ডবার ।।
*** *** ***

কৃত্তিবাস —

হাতে ধনুর্বাণ রাম আইসেন ঘরে ।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ।।
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল ...... দক্ষিণে ।
তোলা পাড়া কত করেন রাম মনে ।।

সামাজিক পাপপুণ্যের ধারণা সম্বন্ধে কন্দলী ও কৃত্তিবাসের বিবরণের মধ্যে যে স্মার্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের ঐক্য দেখা যায় তা দ্বারা পূর্বাঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন মেলে । রামের বনযাত্রার পর ভরত এসেছেন অযোধ্যায় । কৌশল্যা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ভরতের যোগ আছে অন্তত: সমর্থন আছে মনে করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন । তখন ভরত নিজে নিষ্পাপ, রাম বনবাসের সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য সমকালের প্রথানুসারে কতগুলি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন । কন্দলীর ভরতের উক্তি —

মোহোর কপট যেবে সত্য পটুরাও ।
মিছা যেবে বোলো ব্রহ্ম বধ পাপ পাওঁ ।।
দশ কপি লোক মারো গুরুভার্য্যা হরো ।
রামক পাঠাইলো বনে আত্মঘাত করো ।।
মোর বোলে বুলিলা কৈকেয়ী নিজ মায় ।
ঘোর নরকত তেবে মোর হৌক ঠায় ।।
বচনে দিলেক দান নিদিলে অধর্ম ।
রাজদ্রোহ করিলে যতেক পাপ কর্ম ।।
সব পাপ পাওঁ যেবে মোর আছে মন ।
যত ধর্ম করি আছো সিত্ত হবে ক্ষুন ।।

কৃত্তিবাসের ভরতের উক্তি –

মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে ।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ।।
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন ।
তোমারে করুন বিধি সে পাপ ভাজন ।।
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে ।
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে ।।
বিদ্যা পেয়ে গুরুকে যে না করে সেবন ।
কর্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন ।।
আপনা বাখানে যেবা পর নিন্দা করে ।
সেই মহাপাপ রাশি ঘটুক আমারে ।।
স্থাপ্য ধন হরণেতে যে হয় পাতক ।
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক ।।
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই ।
ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ।।

এই জাতীয় দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায় । আসলে মোটামুটি এক জাতীয় সংস্কার সংস্কৃতি জীবনবোধ ও সামাজিক চেতনার পরিমন্ডলে উভয় কবির স্থিতি-কাল ব্যবধানের খানিকটা বিভিন্নতা, স্থানের দূরত্ব জনিত কিছুটা পার্থক্য আছে বটে, তবে তা নগণ্য । কারণ মধ্যযুগের ভূগোল-ইতিহাসের মন্থরতার মধ্যে জীবনধারার পরিবর্তন, রাজ্যবিপ্লব না ঘটালে, তেমনটা হতো না । কন্দলী ও কৃত্তিবাস উভয়েই মধ্যযুগের এই ধারার প্রতিনিধি । প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই উভয় কবির রামায়ণ অনুবাদে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় । কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে, পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি গুরুতর কারণ ছিল, বিপুল জনপ্রিয়তার হেতু বিপুল পাঠান্তর । তবুও মূল কাঠামোটির খুব একটা পরিবর্তন হয় নি, এটা ধরে নেওয়া যায় ।

এবার দুই কবির ভণিতা অংশের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে — তাঁদের মানসিকতার ঐক্য ও অনৈক্যের পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক্ । কন্দলীর কয়েকটি ভণিতা —

১) পরম অমৃত রামর চরিত্র
শুনা সামাজিক যত ।
অসার সংসার আর আশা এরি
করিয়ো মতি রামত ॥
রামর ভকতি এহি সে সম্পত্তি
সমস্ত শাস্ত্র সমত ।
থিরমন করি বোলা হরি হরি
নাশোক দুই শাবত ॥

২) অযোধ্যা কান্ড শেষে রামের বনবাস সম্বন্ধে কন্দলীর ভণিতা অল্প দীর্ঘ । সেখানে তিনি রামের মহিমার সঙ্গে মন্থরার মতো কুসঙ্গ ত্যাগের কথা বলেছেন —

হেন নিষ্ঠ জানি দুঃসঙ্গ এড়িয়া
লৈয়ো সঙ্গ মহন্তর ।
তোমাসব সহিতে বসি এক প্রীতি
শুনিয়ো কথা রামর ॥
... ...
কলিত সম্প্রতি নাহি আন গতি
বিনে মাধবর নাম ।
মাধব কন্দলী কহে নিরন্তরে
ডাকি বোলা রাম রাম ॥

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডের শেষ ভণিতা —

বাল্মীকি রচিলা শাস্ত্র পদ্য পদ্য ছন্দে ।
তাহাক বিচার আমি করিয়া প্রবন্ধে ।।
আপোনার বুদ্ধি অর্থ যিমতে বুজিলো ।
সংক্ষেপ করিয়া তাক পদ বিরচিলো ।।
সমস্ত রসক কোনে জানিবাক পারে ।
পক্ষী সব উরয় যেন পক্ষা অনুসারে ।।
কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে ।
কতো নিজ কতো লম্ভা কথা অনুসারে ।।
দেববাণী নুহি ইটো লৌকিক হে কথা ।
এতেকে ইহার দোষ ন লৈবা সর্বথা ।।
রামর চরিত্র বুলি তরিয়ো সংসার ।
অলস তেজিয়া রাম বোলা বারে বার ।।

৪) সুন্দরা কান্ডের অন্ত ভণিতা-টি দীর্ঘ ।

***   ***   ***

শুনিয়োক সভাসদ   মধুর কোমল পদ
পুণ্য কথা রামর চরিত্র ।
যমপথ নিবারণ   কলিমল সংহারণ
মহারস শ্রবণে অমৃত ।।
ভবভয় বিনাশন   মহামোক্ষ প্রকরণ
সমস্ত ধর্মরে ইসে সার ।
জানি শুনা যত্ন করি   ডাকি বোলা হরি হরি
তেবে সুখে তরিবা সংসার ।।

৩) লঙ্কাকাণ্ডের শেষ ভণিতাটি সুদীর্ঘ। তার একাংশে কাব্য রচনার ইতিহাস, পৃষ্ঠপোষক মহামাণিক্যের কথা আছে। ভণিতাটি কন্দলীর কাল ও পরিচয় প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ভণিতার প্রথমাংশটি মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতি —

রামায়ণ কথা শুনি   শরীর নিষ্পাপ সব
সকল আপদ হেলে তরি।
যত সব ধর্ম চয়   সব অপ্রয়াসে নিজে
ন যাইবেক যমর নগরী॥
গুর্বিনী সুপুত্র জনে   রূপবতী কন্যাগণে
মন অভিলাষে পাবে স্বামী।
আয়ু বাঢ়ে পাবে সুখ   আরোগ্য জীবয় লোক
অন্তকালে হোবে স্বর্গগামী॥

***   ***   ***

পণ্ডিত লোকর যেবে   অসন্তোষ উপজয়
হাত যোরে বোলে শুদ্ধ বাক॥
পুস্তক বিচারি যেবে   তৈতে কথা না পবাহা
তেবে সবা নিন্দিয়া আমাক॥

***   ***   ***

অগণিত পরীক্ষিয়া   সীতাক অযোধ্যা নিয়া
সকুটুম্বে ভৈলা একঠাই।
মাধব কন্দলি গাইলা   শ্রীরাম অযোধ্যা পাইলা
জয় জয় আনন্দ বধাই॥

কৃত্তিবাসের ভণিতা সাধারণত: একটি পয়ারে অর্থাৎ দুটি চরণে রচিত। শেষ চরণটিতে কেবল নিজের নাম 'আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।' 'আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।' দুচরণের পয়ারের দৃষ্টান্ত —

১) আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জীবন॥

২) শ্রীরাম যে জন তার হয় সর্বনাশ ।
পাইল অযোধ্যা কান্ডে কবি কৃত্তিবাস ।।

৩) কৃত্তিবাস পন্ডিতের রহিল বিষাদ ।
শ্বশুরের পিন্ডদানে বধূর প্রমাদ ।।

৪) ফুলিয়ার কৃত্তিবাস পায় সুধা ভান্ড ।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কান্ড ।।

৫) জিজটার স্বপ্ন সত্য কহে কৃত্তিবাস ।
রাবণের হবে শীঘ্র সবংশে বিনাশ ।।

৬) কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস ।
সীতার পরীক্ষা গীত গায় কৃত্তিবাস ।।

ভণিতার মধ্যে কবির অনুভব ও সহানুভূতির যে প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে উত্তরকালে প্রচলিত পাঁচালী সাহিত্যেও তার অনুরূপ হয়েছিল কিন্তু কৃত্তিবাসে তা একান্ত অস্ফুট । কন্দলীর মতো বিশদ নয়, তবু কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ । বালিবধ রামচরিত্রের একটি কলঙ্ক বলে পরবর্তী সাহিত্যে চিহ্নিত । এমন কি মহাভারতে দ্রোণবধের সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই প্রতারণাপূর্ণ বাক্যে যে পাপ হয়েছে – তা রামের বালিবধের তুল্য – এমন কথা বলেছিলেন অর্জুন । বালিবধে কৃত্তিবাসের ভণিতা –

কৃত্তিবাস পন্ডিতের থাকিল বিষাদ ।
ধার্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ ।।

কিন্তু কন্দলী সরাসরি কোন মন্তব্য করেননি তবু তাঁর ভণিতার মধ্যে করুণাময় রামের বেদনা আভাসিত —

তারার বিলাপ দেখি লক্ষ্মণ সুগ্রীব বীর
শ্রীরামচন্দ্র কৃপাময় ।
বিপরীত শোক শেলে তিনিয়ো শরীর দহে
চক্ষু ঢাকি লোতক বহয় ।।

উপসংহার

মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনামূলক মূল্যায়ণকে - কেবল অসমীয়া ও বাঙালী দুই কবির বা রামায়ণের অসমীয়া ও বাংলা অনুবাদক হিসেবে মাত্র গণনা ও হিসেব করলে, মনে হয় খুব বেঠিক ও অযথার্থ কাজ হবে । কারণ মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গটি রামানন্দের শক্তিসঞ্চারে উত্তর ভারতের - সকল দিকে, সকল ভক্তমানসে রামচন্দ্র তথা রামায়ণকে কেন্দ্র করে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল । পূর্ব ভারতে তার দুটি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শীর্ষ কন্দলী ও কৃত্তিবাস । তাঁদের পূর্বাপর স্থিতি, কাল ব্যবধানের সাল তারিখের চুলচেরা বিচার এক্ষেত্রে গৌণ এমন কি অবান্তর-ও বলা যায় । আসলে তাঁরা দুজন রাম-ভক্তি আন্দোলনের, দুই সহোদরা ভাষার ও সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি মাত্র । দুই কবির মানসে রামভক্তির আবেগ যে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিল এবং অসমীয়া ও বঙ্গভাষী জনগণের অন্তরে যে রাম-ভক্তির বন্যা সৃষ্টি করেছিল – সেটাই মুখ্য । অবশ্য কন্দলীর কাব্যে শঙ্করদেব ও মাধবদেব ভক্তিরস দিয়েছেন বলে উক্তি আছে। তবে আসা-যোগ মাত্র। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভণিতাসূত্রী আলোচনাতে – রামভক্তির যে কথা সর্বদা দুই কবি আভাসে, কাহিনী বর্ণনার অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে । কিন্তু কাহিনী সংশের মুখ্য ভাবে রাম কথা ততোধিক রাম নাম মাহাত্ম্য বর্ণনায় যে দুই কবি সমান ভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন – তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক ।

কন্দলী – প্রণাম সূত্র রূপে সুন্দরাকান্ড ও লংকাকান্ডের প্রারম্ভে এই দুলড়ীটি দিয়েছেন –

নমো নারায়ণ বিঘিনি খন্ডন
রঘুর নন্দন রাম ।
সহস্রেক বাহু সহস্রেক শির
যার সহস্রেক নাম ।।
বাপর সত্যক পালিয়া রাঘব
সীতা সয়ে গৈলা বন ।
বোলন্ত কন্দলি আন গতি নাই
রাঘব দুই চরণ ।। (১১৯৫।৪৮৯)

অরণ্য কাণ্ডের শেষে কোন কাহিনীর সঙ্গে অসংযুক্ত একটি রাম প্রার্থনার দুলড়ী আছে । তার খানিকটা অংশ —

নমো নমো রাম দুর্বাদল শ্যাম
তনু অতি অনুপাম ।
সর্ব পুরুষার্থ শিরত প্রকাশ
করে যার গুণ নাম ।।
সর্ব শ্রুতিরত্ন শিরত বিরাজ
যাহার পদ কমল
সর্ব ধর্ম সার যার যশরাশি
মঙ্গলরো সুমঙ্গল ।।" (১৩৮৭)

*** *** ***

মলিন জনর ধর্মত কর্মত
জোনা নাহি অধিকার ।
দুই গুটি অক্ষর রাম নাম লৈয়া
তরিয়ো সুখে সংসার । (৩৩১০)

*** *** ***

হেন জানি জন্ম জীবন্ত সাফলি
ধরা মাধবর নাম ।
ডাকি মুখ ভরি বোলা উচ্চ করি
নিরন্তরে রাম রাম ।। (৩৩১১)

এবার কৃত্তিবাসের কাহিনী সম্পর্ক বিরহিত রাম মাহাত্ম্য রচনা —

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম ।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ।।
সুকৃত জনন দুস্কৃত দমন শ্রুতি সুখ রামায়ণ ।
শ্রবণ মনন করে যেই জন তারে তুষ্ট নারায়ণ ।।

রামনাম জপ ভাই অন্য কর্ম মিছে ।
সর্বধর্ম কর্ম রাম নাম বিনা মিছে ।।
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে ।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেব লোকে ।।

*** *** ***

অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা ।
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা ।।
রাম জন্ম পূর্বে সহস্র বৎসর ।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ।।
রামনাম স্মরণে বৎসর দায় এড়ি ।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী ।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ ।।

ভক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারায় কৃষ্ণকথার উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল – পূর্বপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশংকরদেব । ভক্তি-ধর্মেরই নব রূপ । যেন ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের পর দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের অবতার । ভক্তি ধর্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত । কলিযুগের তারক ব্রহ্মনাম ষোড়শাক্ষের ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

তিনটি নাম – হরি, কৃষ্ণ, রাম । হরি হচ্ছেন স্বরূপে স্থিত অব্যক্ত পূর্ণব্রহ্ম পুরুষ – অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের দুই রূপ – শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ । এইজন্যই বোধহয় নামের অনুপাত হরি - ৮, রাম - ৪ ও কৃষ্ণ - ৪ ।

যাহোক রামকথা ও রামায়ণ সংস্কৃতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি পুনরুল্লেখ করি – 'গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি । রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য । ... রামায়ণে ভারত যাহা চায় তাহা পাইয়াছে ।" এই পরম প্রাপ্তির জন্য অসমীয়া ও বাংলা ভাষী মানুষ কবিদলী কৃত্তিবাসের কাছে চিরঋণে বদ্ধ চিরকাল ।